একক ১ ❐ চর্যাপদ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ চর্যাগীতি আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত
১.৪ পুথি পরিচয়
১.৫ নাম-বিতর্ক
১.৬ রচনাকাল বিতর্ক
১.৭ চর্যার ধর্মতত্ত্ব
১.৮ চর্যার ভাষা
১.৯ চর্যার সাহিত্যমূল্য
১.১০ অনুশীলনী
১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

পৃথিবীর যে-কোনো ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আদিপর্বে কাব্যধারাটিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর কতগুলি সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমত লিপি আবিষ্কৃত হয়নি এবং পরে লিপি আবিষ্কৃত হলেও লেখার কৃৎকৌশল কম লোকেই জানতেন। দ্বিতীয়ত মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার জানা ছিল না বলে মুদ্রিত গ্রন্থ বলে কোনো বস্তু ছিল না। ফলে সাহিত্যবস্তু মুখ্যত স্মৃতি ও শ্রুতি বাহিত হয়ে বিস্তার লাভ করত। যাঁরা লিপিকৌশল জানতেন তাঁরা রচনা পুথিতে বিধৃত করতেন। তবে রচনা সম্প্রসারণে স্মৃতি ও শ্রুতিই ছিল মুখ্য মাধ্যম। স্বভাবতই সুর, তাল, লয় ও ছন্দ সমন্বিত শ্রুতিসুভগ পদ স্মৃতিধার্য হয় সহজে। ফলে যে-কোনো ভাষা-সাহিত্যের আদিপর্বে কাব্যধারাটিই প্রবল।

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি সত্য। উনিশ শতকে ইংরেজি বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানচর্চার প্রভাবে বাংলা গদ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এর আগে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন ছিল কাব্য—কবিতা।

স্বভাবতই বাংলা কাব্যধারার আদি নিদর্শন কোনটি এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে। দেশজ সাহিত্যধারা সংক্রান্ত এমন উৎসমুখী প্রশ্ন উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ফলেই জাগ্রত হল। উনিশ শতকে নবজাগ্রত বাঙালি পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্যার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বজাতির অতীত বৃত্তান্ত রচনায় ব্রতী হলেন। এই সূত্রে পুরোনো বাংলা সাহিত্য তাঁদের আগ্রহের অন্যতম বিষয় হল—সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাসের অনুসন্ধান করা শুরু হল। ১৩০৫ সনের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-য় 'ইতিহাস রচনার প্রণালী' প্রবন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত লিখলেন, 'দরিদ্র মুকুন্দরামের সংগীতের সহিত তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজের ইতিবৃত্ত জড়িত রহিয়াছে। আদি কবি কৃত্তিবাসের গ্রন্থের বিশ্লেষণ করিলেও সেই সময়ের বাঙ্গালী চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।' রজনীকান্ত গুপ্তের এই পদ্ধতি অনেকেই অনুসরণ করেছিলেন।

সাহিত্যের মধ্যে জাতির অতীত পরিচয় লাভ করা সম্ভব এই ধারণার পাশাপাশি প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বর্তমান ভাষার পূর্বরূপসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা যায় এই প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩০৫ সালের কার্তিক সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল লেখকের নামবিহীন রচনা 'সাহিত্যপঞ্জী'—পুরোনো বাংলা সাহিত্যের ভাষা নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ সেখানে ছিল। অবশ্য শুধু ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানের জন্য এবং ঐতিহাসিক/তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে পুরোনো বাংলা সাহিত্য পড়া হত না, সাহিত্য হিসেবেও এর কদর ছিল। বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদের পদ, কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী', মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল', ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল যথার্থ সাহিত্য হিসেবেই পরিগণিত হত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদকর্তাদের রসিক পাঠক ছিলেন। 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনার গুণাগুণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

মনে রাখতে হবে উনিশ শতকে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনগুলি সহজলভ্য ছিল না। মুদ্রণপ্রযুক্তি-পূর্ববর্তী সময়ে পুথিতেই রচনার লেখরূপ বিধৃত হত। যাঁদের কাছে পুথি ছিল তাঁরা সেগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে পারতেন না, অথবা করতে চাইতেন না। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের জীবন ও কাব্যসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে ইতিহাসের উপাদান, ভাষাতত্ত্বের উদাহরণ কিংবা সাহিত্য-রসাস্বাদন, যে উদ্দেশ্যই পাঠক সাধন করতে চান না কেন সবার আগে সাহিত্য-নিদর্শনটিকে মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সংগ্রাহকরা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় প্রমুখ) বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পুথির অনুসন্ধান করতেন। পুথি আবিষ্কৃত হলে নানা পদ্ধতিতে পুথিটিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলা হত। তারপর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হলে কাব্যটি সাধারণ রসিকের পর্যালোচনার বিষয় হত।

যেহেতু উনিশ শতকে আবিষ্কৃত সাহিত্যের উপাদানগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদগুলিই ছিল প্রাচীনতম সেহেতু উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে সেগুলিকেই চিহ্নিত করা হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই পুথি সংগ্রহের জন্য ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল যাত্রা করেন। এই পর্বে নেপাল-দরবার গ্রন্থাগার থেকে তিনি বেশ কিছু বৌদ্ধগান ও দোহা পান। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়', সরোজব্রজের সটীক 'দোহাকোষ', মেখলা টীকাসহ কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ' এবং বৌদ্ধতন্ত্রের পুথি 'ডাকার্ণব' একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করতে হয়। নানা তর্ক-বিতর্কের পর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে তথ্য ও যুক্তিসহ 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর ভাষা যে বাংলা তা প্রতিষ্ঠা করেন।

'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর নির্বাচিত পদ পাঠ করলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের আদি নিদর্শন সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করা সম্ভব।

১.২ প্রস্তাবনা

'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়' সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের (পুরোনো) বাংলা কাব্যধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে হবে। এই পর্বের অধিকাংশ কাব্যই ছিল ধর্মাশ্রিত। অবশ্য সমস্ত কাব্যে ধর্ম উপাদানটি সমভাবে ব্যবহৃত হয়নি—প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা ছিল। কোথাও কাব্যে সাধনপদ্ধতি বর্ণিত হত, কোথাও থাকত ধর্মসংক্রান্ত দার্শনিক ভাবনা, আবার কোথাও দেবতার ক্ষমতা সংক্রান্ত নানা দীর্ঘ কাহিনি রচিত হত। তবে এই ধর্মাশ্রিত সাহিত্য কখনই জীবনের উপাদানগুলিকে বাদ দিত না। আসলে ধর্মমুখী সাহিত্য,

জীবনমুখী সাহিত্য এই বিভাজন রেখাটি ইংরেজ-প্রভাব পূর্ববর্তী সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। আদি যুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের সঙ্গে জীবনরসও খানিকটা মিশে গেছে। এবং সেটা স্বাভাবিক।

চর্যাগীতিগুলি আদতে যে দেহতত্ত্বের গান সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই। তবে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' গ্রন্থে যেভাবে দেখিয়েছেন যে প্রাক্-ইংরেজ বাংলা সাহিত্যে পার্থিব ও অপার্থিব চিন্তাধারা পরস্পরলঙ্ঘী তেমনই চর্যার দেহতত্ত্বের গানে অন্য প্রবণতা মিশে থাকা সম্ভব। এই গীতিগুলি পাঠ করার সময় তাই আমরা ভাব ও প্রকরণ দুয়ের দিকেই নজর দেব। প্রকরণের আলোচনায় আসবে ভাষা-ছন্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। ভাবগত আলোচনার মুখ্য উপজীব্য হবে সাধনতত্ত্ব। অর্থাৎ চর্যাকাররা যে ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী সেই ধর্মতত্ত্বের অন্তিম লক্ষ্য কী ছিল এবং কেমন করেই বা তা পাওয়া সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন তা ভাবগত আলোচনার বিষয় হবে। পদগুলিকে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাও জরুরি। পরিশেষে পাঠ্য পদগুলির সরলার্থ, আভিপ্রায়িক অর্থ ও সাহিত্যমূল সংক্রান্ত আলোচনাও থাকবে। সবার আগে অবশ্য এই পদগুলির আবিষ্কারের উদ্দেশ্য, ইতিবৃত্ত, আবিষ্কৃত বস্তুর পরিচয় এবং সম্পাদিত গ্রন্থের রূপ ইত্যাদির আলোচনা জরুরি। কারণ এই বিশশতকীয় প্রকল্পের সৌজন্যেই দশম শতাব্দীর (রচনাকাল সম্বন্ধীয় বিতর্ক পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে) পদগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

১.৩ চর্যাগীতি আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত

রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতায় বিচলিত হয়ে পাল রাজত্বের পরবর্তী সময়ে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গৌড়ভূমি সংলগ্ন দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে আশ্রয় নেন। নেপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ফলে উনিশ-বিশ শতকের পুথি-সংগ্রাহকরা নেপাল থেকে বহু বৌদ্ধপুথি পেয়েছিলেন। হজসন (Brian Hodgson) সর্বপ্রথম নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেকগুলি পুথি আবিষ্কার করেন এবং পরীক্ষার জন্য সেগুলি বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। বুর্নফ (Eugene Burnouf) এই পুথিগুলির ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা করেন। হজসন-এর পর নেপালে গিয়েছিলেন রাইট (Daniel Wright)। তিনিও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেকগুলি মূল্যবান পুথি সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। হজসন ও রাইট-এর পর অনেকেই নেপালে যান। বেন্ডাল (Cecil Bendall) ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালে গিয়ে 'সুভাষিত সংগ্রহ' নামে একখানি পুথি নিয়ে আসেন ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই পুথি-সংগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম। শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিসংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত হয়ে তিনবার নেপালে গিয়েছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে দুবার ও ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আরেকবার নেপাল যান। শাস্ত্রীর প্রথমবার নেপাল যাওয়ার আগেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছিল। বেন্ডাল, কাওয়েল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথির বিবরণ এবং তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয়বার নেপার যাওয়ার আগে বেন্ডাল-এর সুভাষিত সংগ্রহও হাতে এসেছিল। শাস্ত্রীমশাইয়ের তৃতীয়বার (১৯০৭) নেপালযাত্রা অবশ্য বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। এইবারে তিনি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর সন্ধান পান ও নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার থেকে তিনি প্রাপ্ত পুথির নকল তৈরি করে আনেন। শাস্ত্রীমশাই অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থও পেয়েছিলেন। এগুলি হল যথাক্রমে—১. সরোজব্রজের সটীক 'দোহাকোষ', ২. মেখলা টীকাসহ কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ', ৩. বৌদ্ধতন্ত্রের পুথি 'ডাকার্ণব'।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'হাজার পুরাণ বছরের বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে সংগৃহীত পুঁথিগুলি প্রকাশ লাভ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরেও চর্যা সংক্রান্ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়। শাস্ত্রীমশাই এই গানগুলির তিব্বতি অনুবাদের কথা জানতেন কিন্তু সেই

অনুবাদ তিনি ব্যবহার করতে পারেননি। তিব্বতি অনুবাদটির প্রথম সন্ধান করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'Indian Historical Quarterly' (Vol. III, 1972) পত্রিকায় এই তিব্বতি অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়। পুথিখানির তিব্বতি অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষুর যুগ্ম সম্পাদনায় 'চর্যাগীতিকোষ' নামে প্রকাশিত হয়। তিব্বতি অনুবাদ থেকে জানা গেল মূলে একশোটি চর্যার একটি সংকলন ছিল। শাস্ত্রীমশাই-এর প্রাপ্ত পুথি যা আদতে টীকাগ্রন্থ তাতে ৫০টি পদ সংকলিত। পরবর্তী এই আবিষ্কারগুলি চর্যাসম্বন্ধীয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার বাংলা ভাষার আদি নির্দশন প্রাপ্তি সংবাদ হিসেবে সাধারণ জনমানসে যে আন্দালন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল সেরকম কোনো আন্দোলন এই পরবর্তী আবিষ্কারগুলি সৃষ্টি করতে পারেনি।

অধ্যায় সংক্ষেপ : জাতীয়তাবাদী আদর্শে ও জ্ঞানচর্চার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৃতীয়বার নেপাল যাত্রার (১৯০৭) সময় যে পুথিসমূহ পান তা 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৯১৬) নামে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রীমশাই দাবি করেন এগুলি বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন। পরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যও আবিষ্কৃত হয়।

১.৪ পুথি পরিচয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর আবিষ্কৃত পুথিসমূহের ভাষা আদি বাংলা বলে মনে করলেও ভাষাতাত্ত্বিকরা এই মত স্বীকার করেননি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development opf the Bengali Language' গ্রন্থে প্রমাণ করেন শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামধেয় (নাম সম্পাদক প্রদত্ত) পুথিটিই বাংলা ভাষার প্র- নির্দশনবাহী, অন্যগুলি নয়। সুতারং এই পুথিটিই বাংলা বিদ্যাচর্চা রসিকদের বিবেচ্য। সাধারণভাবে এটিই চর্যাপদের পুথি হিসেবে পরিচিত।

নামপত্রে পুথির মাপ ১২$^{৩}/_{৪}$″ +১$^{৭}/_{৮}$″। তালপত্রের পুথি। মূলে খুব সম্ভবত ৭০টি পাতা ছিল। পুথিটি খণ্ডিত। মাঝের কয়েকটি পাতা (৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৬) নেই, শেষ পাতাটিও সম্ভবত পাওয়া যায়নি। পাতার উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা। প্রতি-পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি লিখিত, ব্যতিক্রম ৬৫ক পৃষ্ঠা। পুথির লিপি বাংলা, কদাচিৎ নেওয়ার লিপির কিছু নমুনা আছে। নাগরি লিপিতেও পরবর্তী সংশোধন প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। নামপত্রের ৭৪১ সংবৎ তারিখটি থেকে অনুমান করা যায় পুথিটি প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষুশাস্ত্রীর যুগ্ম সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'চর্যাগীতিকোষ'। এই তিব্বতি অনুবাদটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথি সম্বন্ধীয় কিছু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় এবং প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য জানা যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণাা ছিল তিনি গান ও দোহার পুথি আবিষ্কার করেছেন, টীকা আনুষঙ্গিক। কীর্তিচন্দ্রের তিব্বতি অনুবাদ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেল শাস্ত্রী মূল গান ও দোহার পুথি আবিষ্কার করেননি ; টীকাগ্রন্থ আবিষ্কার করেছেন। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। মূলগীতি সংগ্রহের গীতি সংখ্যা ১০০, টীকাকার তার থেকে ৫০টি বাছাই করে টীকা রচনা করেন। সচরাচর টীকাগ্রন্থে মূল গীতি থাকে না, এদিক থেকে এই টীকাটি ব্যতিক্রম।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর 'চর্যাপদ' শীর্ষক পুস্তিকায় তিব্বতি অনুবাদটি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকী শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে হয়তো মুনিদত্ত তাঁর টীকায় গানগুলির উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। গানগুলি পরবর্তী সংযোজন।

১.৫ নাম-বিতর্ক

বাংলাভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে যে গ্রন্থদুটি পরিগণিত হয় সেই 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—দুটিকে ঘিরেই নামকরণ বিতর্ক বর্তমান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন '১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কতকগুলি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্য্যাপদ।' লক্ষণীয় শাস্ত্রী মহাশয় সংকলিত গীত ও সংস্কৃত টীকা দুয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'চর্যাগীতির ভূমিকা' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন নাম-বিতর্কের দুটি নিরিখ। এক দল সংকলিত গীতের সূত্রে নামকরণ করতে চেয়েছেন, অন্য দলের বিবেচ্য সংস্কৃত টীকা। পণ্ডিতদের মধ্যে কে কোন্ নাম প্রয়োগ করতে চান তা প্রথমে উল্লেখ করা যাক।

নামকর্তা	**প্রদত্ত নাম**
বিধুশেখর ভট্টাচার্য	আশ্চর্যচর্যাচয়
প্রবোধচন্দ্র বাগচী	চর্যাগীতিকোষ
সুকুমার সেন	চর্যাগীতি পদাবলী

তিব্বতি অনুবাদের সাক্ষ্য মান্য করে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, এটি পদসংকলন পুথি নয়, টীকা, তাহলে 'চর্যাগীতিকোষ', 'চর্য্যাপদ', 'চর্যাগীতি পদাবলী' ইত্যাদি নাম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিধুশেখর ভট্টাচার্য টীকার বস্তুনির্দেশক শ্লোকের 'আশ্চর্যচর্যাচয়' শব্দসাপেক্ষে এর নাম তাই রাখতে চেয়েছিলেন। তবে আবিষ্কারক-সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্মানার্থে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী অনেকেই। যে গ্রন্থে সিদ্ধাচার্যদের চর্য (আচরণীয়) ও অচর্য (অনাচরণীয়) নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করা হয়েছে তাই নাকি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চর্যাগীতিকোষ'-এর ভূমিকায় ভিক্ষুশাস্ত্রীও এই মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সুকুমার সেন মনে করেন 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ রূপটি হওয়া উচিত 'চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়'।

১.৬ রচনাকাল বিতর্ক

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-নিদর্শনগুলির কাল নির্ণয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তবে কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাসের কাল নির্ণয়ের সমস্যার চেয়ে চর্যাগীতির কাল নির্ণয়ের সমস্যাটি গোত্রগতভাবে ভিন্ন রকমের। কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাস একক কবি। চর্যাগীতির রচয়িতা একজন নন, বহুজন। এই সমস্ত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। আবার এঁদের রচিত অন্যান্য নানা সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই সূত্রগুলিকে একত্রিত করে চর্যাগীতির রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে গবেষকবর্গ এ বিষয়ে সহমত হতে পারেননি। প্রথমে আমরা চর্যার রচনাকাল হিসেবে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ কে কোন সময়টিকে কী কারণে নির্দেশ করেছেন তা সারণি আকারে সাজিয়ে দিচ্ছি।

রচনাকাল নির্দেশকের নাম	**রচনাকাল**	**সিদ্ধান্তের কারণ**
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ অতীশ দীপঙ্করের 'অভিসময়বিভঙ্গ' রচনায় সাহায্য করেন। অতীশ দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান। চট্টোপাধ্যায় লুইকে অতীশের

		'elder contemporary' মনে করে রচনাকালের ঊর্ধ্বসীমা হিসেবে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দকে নির্দেশ করেছেন। নিম্নসীমায় রয়েছেন কাহ্নপাদ। কাহ্নপাদের 'হেব্রজ-পঞ্জিকা-যোগর-ামালা'র অনুলিপি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং কাহ্নপাদের জীবৎকালের নিম্নসীমা ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
রাহুল সাংকৃত্যায়ন	অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে।	তাঁর মতে আদি সিদ্ধাচার্য সরহপাদ। ইনি শান্ত রক্ষিতের সমসাময়িক। শান্ত রক্ষিত ভোট-সম্রাট 'খি-স্রোঙ-দে চন্'-এর রাজত্বকালে (৭৫৫-৭৮০) তিব্বতে যান। সাংকৃত্যায়ন মনে করেন লুইপাদ ধর্মপালের রাজত্বে শেষভাগ (৮০০) পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।
শহীদুল্লাহ	সপ্তম শতাব্দীতে চর্যাপদের রচনা শুরু।	শহীদুল্লাহের মতে আদি সিদ্ধাচার্য শবরপাদ। শবরপাদ কমলশীলের জন্য সংস্কৃতে দুটি বই লেখেন। কমলশীলও তিব্বত-রাজ কি-স্রোং-দে-চন-এর আহ্বানে ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান। এছাড়াও কম্বলাম্বরপাদ রাজা ইন্দ্রভূতির দীক্ষাগুরু। ইন্দ্রভূতি পদসম্ভবের (৭২১/২২) পালকপিতা। সুতরাং কম্বলাম্বরপাদ সপ্তম শতাব্দীর লোক।

প্রশ্ন হল পণ্ডিতবর্গের এই মতভেদ কি নিরসন করা সম্ভব ? একবাক্যে সম্ভব নয়। তবে সুনীতিকুমার তাঁর বিচারে সিদ্ধাচার্যদের নিয়ে প্রচলিত কাহিনি ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেননি। সিলভাঁ লভি, লামা তারনাথ, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ কিংবদন্তিগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিংবদন্তি পাথুরে প্রমাণ নয়। তাই চর্যাগীতিগুলির রচনাকালের সীমা খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধরা যেতে পারে।

১.৭ চর্যার ধর্মতত্ত্ব

চর্যাগীতিগুলিতে সিদ্ধাচার্যদের আচরণীয়-অনাচরণীয় কৃত্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশ বৌদ্ধদর্শন-সাপেক্ষ। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের মধ্যে নানা ভেদ বর্তমান। চর্যার ধর্মতত্ত্ব বুঝতে গেলে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিবর্তনের সূত্রটিও খেয়াল রাখতে হবে। এই ক্রমবিবর্তনের সূত্রেই আমরা চর্যাগীতিগুলিতে সাধনতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করব।

সারথি ছন্দকের সঙ্গে পরিভ্রমণে গিয়ে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্ম-জরা-মযত্যুময় যে জগৎ দেখেছিলেন তা তাঁকে বিচলিত করেছিল। এতটাই বিচলিত করেছিল যে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ পরিণত হলেন তথাগত বুদ্ধে। হিন্দু রাজবংশে জন্মগ্রহণ করলেও হিন্দুধর্মের সংস্কার অতিক্রম করে এক নতুন ধর্মমত ও পথের সন্ধান দিলেন তিনি। তাত্ত্বিকরা অবশ্য বুদ্ধদেবের প্রচারিত এই ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনো কোনো ধারণার মিল খুঁজে পান কিন্তু বৌদ্ধধর্ম আলাদা ধর্ম হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। বলা যেতে পারে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন বুদ্ধদেব। অনাত্মবাদী, ক্ষণত্ববাদী বৌদ্ধধর্ম যাগযজ্ঞপ্রধান কর্মফলবাদী হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের থেকে আলাদা।

বুদ্ধদেব দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন, মূর্তিপূজার গুরুত্ব স্বীকার করেননি, দুঃখময় জগতে দুঃখের হেতু নির্ধারণ করে মধ্যপথ অবলম্বনের মাধ্যমে তার থেকে নির্বাণ লাভ করতে বলেছেন। অর্থাৎ ধ্রুপদী বৌদ্ধধর্মে পঞ্চস্কন্ধ সমবায়ের বিলোপসাধনই নির্বাণ এবং এই নির্বাণই সাধ্যবস্তু।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর নির্বাণের স্বরূপ, উপায় ও উদ্দেশ্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। নির্বাণ কি দুঃখময়, নাকি তাতে অনন্তসুখ? তা কি অভাব-স্বভাব ও অবাস্তব কিংবা ভাবস্বভাব ও বাস্তব? সে কি জন্মমৃত্যুর অতীত শাশ্বত জীবন, না কি কেবলই স্থূলদেহের নিশ্চিত বিনাশ? নির্বাণ কি শুধু অহংজ্ঞানের বিলোপ, না তা একটি অবিমিশ্র সুখবাদ? রাজগৃহের, বৈশালীর, পাটলীপুত্রের এবং কনিষ্কের সময়ে অনুষ্ঠিত মোট চারটি বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশনে বুদ্ধদেব-প্রদত্ত ধর্মোপদেশের 'অথকথা' বা ভাষ্য নিয়ে যে সমস্ত বিতর্ক হয় তা থেকেই বৌদ্ধধর্মাচরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা যানের সৃষ্টি হয়।

বৌদ্ধধর্ম প্রথমে প্রধান যে জুটি যান ভেঙে গেল সে দুটি হল হীনযান ও মহাযান। হীনযানীরা মনে করতেন বুদ্ধনির্দেশিত ধ্যান এবং অন্যান্য নৈতিক আচার-আচরণের অতি নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার পথেই নির্বাণ লাভ করা যাবে। সাধককে সাধনা করতে হবে শূন্যতার, অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে বিলুপ্ত করার মাধ্যমেই শূন্যতাকে পাওয়া যাবে। হীনযানীদের এই পথ নিবৃত্তিমূলক শূন্যতার পথ—একধরনের আত্মকেন্দ্রিকতাই এর পরিণতি।

মহাযানীরা নির্বাণ লাভ করার সাধনার চেয়ে বুদ্ধত্বলাভের সাধনাকেই বড়ো করে দেখলেন। তাঁদের মতে বুদ্ধদেব ছিলেন করুণাঘনমূর্তি। বিশ্বের সমস্ত করুণা ঘনীভূত হয়েই যেন তাঁর জ্যোতির্ময় দিব্য দেহখানি গড়ে তুলেছিল। তাঁর এই করুণার ক্ষেত্র শুধু বিশ্বমানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিখিল জীবকোটির ভিতর নিঃসীমভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। মহাযানীরা তাই নির্বাণলাভের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের আদর্শ ছিল এই নির্বাণলাভের উপযুক্ত হয়ে নির্বাণকে উপেক্ষা করতে হবে। দুঃখ-প্রপীড়িত প্রাণীদের জন্য কল্প-কল্পান্তর দেহধারণ করে বোধিসত্ত্বকে অবস্থান করতে হবে কুশল-কর্মের জন্য।

পরবর্তীকালে মহাযান ধর্মমতের মহা (বৃহৎ) যানে সমাজের সর্বস্তরের পারগামী লোকের স্থান করতে হল। মহাযান ধর্মমতের বিভিন্ন বিভাজনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল নাগার্জুনের চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত শূন্যতাবাদী মাধ্যমিকবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পরমার্থতত্ত্বকে সত্য বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, তদুভয়ও বলা যায় না—অনুভয়ও বলা যায় না ; তা আছে বলতে পারি না—নেইও বলতে পারি না—আছেও বটে নেইও বটে বলতে পারি না, আছে এবং নেই কোনোটাই সত্য নয় তাও বলতে পারি না। পরমার্থ সত্য এইভাবে চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত—এবং যে তত্ত্ব চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত তাই হল শূন্য।

তন্ত্র হিন্দু না বৌদ্ধ এই নিয়ে তর্ক প্রচলিত আছে। আমরা বলব তন্ত্র হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়। তন্ত্র এক বিশেষ দেহবাদী সাধনপদ্ধতি যা হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করেছিল। অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকেই মহাযানী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের মিলনে বিভিন্ন তন্ত্রাশ্রিত বৌদ্ধযানের উদ্ভব হতে থাকে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নেপাল, ভুটান, তিব্বত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রেই হোক অথবা বাংলাদশের অনার্যগোষ্ঠীর প্রভাবেই হোক বাংলাদেশে এই সময় তন্ত্র বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

বজ্রযানী সাধকরা তাঁদের যানে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ছাড়াও নানা প্রকার দেবদেবীর পূজাঅর্চনা, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য গুহ্য তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রবর্তন করলেন। নেপালে তন্ত্রাশ্রিত বৌদ্ধধর্ম কালচক্রযান নামে পরিচিত হল। কালচক্রযানীরা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কালচক্র অতিক্রম করতে চাইলেন।

বজ্রযানীরা মনে করতেন নির্বাণের পর তিনটি অবস্থা—শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতার পরমজ্ঞানকে তাঁরা বললেন নিরাত্মা এবং নিরাত্মা দেবীরূপে কল্পিত বলে তাঁর নামকরণ হল নৈরাত্মাদেবী। সাধকের বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মায় বিলীন হয়ে যায় তখন জন্ম নেয় মহাসুখ।

বলাই বাহুল্য এই সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য ও কঠিন। গুরু কৃপা ছাড়া এই পথে এগোনো যায় না। তাই বজ্রযানী সাধনপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল গুরু। গুরুরা সাধনমার্গের কোন্ পথে শিষ্যের স্বভাবগত প্রবণতা আছে সেইটা গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসতেন। এই বিচারপদ্ধতিকে বলা হত কুলনির্ণয় পদ্ধতি।

বৌদ্ধধর্মের এই বিভিন্ন শাখায় বিভাজনের বিষয়টিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করা যেতে পারে।

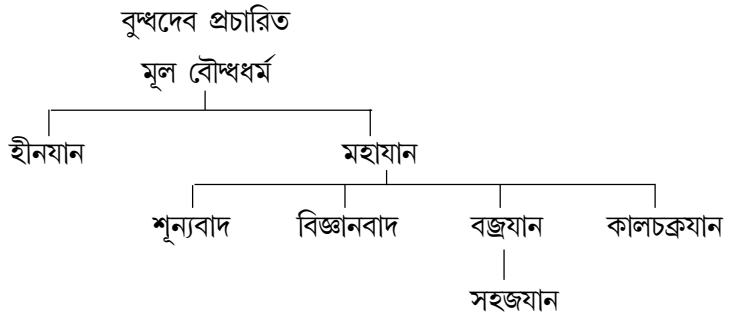

চর্যাকারগণ তাঁদের সাধ্যবস্তু বলে যে মহাসুখকে নির্দেশ করেছেন তাও কিন্তু ইতিবাচক ধারণা। এই ধারণার স্বরূপ বুঝে নেওয়ার জন্য 'সহজ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সহজ শব্দের সাধারণ অর্থ সোজা (easy)। বিশেষ অর্থ সহ জায়তে ইতি অর্থাৎ সহজাত। যে ধর্ম যে বস্তুর জন্ম থেকেই স্বত উৎপন্ন তাই তার সহ-জ। বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস না করলেও ধর্মকায় বা তথতা থেকে উৎপন্ন বোধিচিত্তের কথা বলেছেন। ধর্মকায় নিত্য করুণাময় এবং আনন্দপূর্ণ। নিত্যত্ব, করুণা এবং আনন্দ বোধিচিত্তের সহজাত ধর্ম। বোধিচিত্তের ওই সহজাত ধর্ম অবলম্বন করে সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বলে এ জাতীয় সাধকদের সহজ সাধক বলা হয়।

বিশেষ পারিভাষিক অর্থে সহজ বলতে বোঝায় 'স-হ-জ' অর্থাৎ 'স' আর 'হ' দুটি তত্ত্বের যুগনদ্ধ ফল। 'জ' বলতে বোঝায় যোগ বা মিলন। সরহ পাদের ক-খ দোহা অনুসারে 'স' হল প্রজ্ঞা বা শূন্যতা (স্ত্রীতত্ত্ব) এবং হ-এর অর্থ হল উপায় বা করুণা (পুরুষতত্ত্ব)। এই দুয়ের মিলনে সহজ মহাসুখ লাভ করা যায়—বোধিচিত্তের স্বরূপে স্থিত হওয়া যায়। পার্থিব সুখের মধ্যে নর-নারী মিলন সুখ যেহেতু সর্বোত্তম সেহেতু অনিঃশেষ মিলনসুখের উপমানে সহজ মহাসুখকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনেক চর্যাতেই সহজ মহাসুখের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

১) দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ (১নং)

২) বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা (৮ নং)

৩) সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ (২৭ নং)

৪) নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ (৪৯ নং)

মহাযানীদের নির্বাণ যেমন অনির্বচনীয়, কায়বাকচিত্তের অতীত—তেমন সহজযানীদের নির্বাণজাত মহাসুখও অবাঙ্মনসোগোচর।

কাহ্নপাদ লিখেছেন 'ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।/কাঅ বাক চিঅ জসুণ সমাঅ।।' কায়-বাক চিত্ত যখন এই সহজানন্দের স্তরে উপনীত হয় তখন বাক্যের দ্বারা এর স্বরূপ নির্ণয় কেমন করে সম্ভব? তাই শাস্ত্রজ্ঞান সহজ মহাসুখ লাভের অন্তরায়।

চর্যাকাররা এই সহজ মহাসুখের বিপ্রতীপে রেখেছেন ভ্রান্তিময় জগৎকে। ভুসুকু তাঁর পদে জানিয়ে দিয়েছেন 'আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই'—আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ ভ্রান্তিতে প্রতিভাত হয়। 'মরুমরীচি গন্ধনঅরী দাপণ পতিবিম্বু জইসা। / বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভোইআ অপেঁ পাথর জইসা॥ / বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেলা। / বালুআ তেলেঁ সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা॥ / রাউতু ভণই বাট ভুসুকু ভণই বাটসঅলা আইস সহাব।' মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব, বায়ুর আবর্তে সুদৃঢ় হওয়া জল, বন্ধ্যাপুত্রের বহুবিধ খেলা, বালুকাতেল, শশকশৃঙ্গ, আকাশকুসুম এসবরে মতোই ভ্রান্ত ও অসম্ভব জগতের সব কিছু।

চর্যার সাধ্যবস্তুর আলোচনায় যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া যেতে পারে তা এবার সূত্রাকারে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে :

১) চর্যাকারদের সাধ্যবস্তু সহজমহাসুখ মহাযানীদের নির্বাণের মতো অবাঙ্‌মনোগোচর হলেও তা ইতিবাচক ধারণা।

২) সাধারণ মানুষের পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহে স্থিত সংবৃত চিত্তে ভ্রান্তিবশত আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ প্রতিভাত হয়। পঞ্চস্কন্ধের ধারণা আদি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চর্যাকারদের যোগ এবং আদিতে অনুৎপন্ন জগতের ধারণা বিজ্ঞানবাদীদের সঙ্গে চর্যাকারদের যোগ সূচিত করছে।

৩) সদ্‌গুরুর ইঙ্গিতে সাধক সংবৃত চিত্তকে সহজচিত্তে পরিণত করে স্বসংবেদ্য সহজমহাসুখ অনুভব করবেন।

কোন উপায়ে সেই সহজমহাসুখ অনুভব করা যাবে তা চর্যার সাধনতত্ত্বের অন্তর্গত। বলাই বাহুল্য চর্যার দেহবাদী সাধনতত্ত্বে তন্ত্রাচারের প্রভাব আছে। আমরা প্রথমে তত্ত্বগতভাবে সেই পদ্ধতির উল্লেখ করব।

আমরা আগেই বলেছি 'স-হ-জ' বলতে প্রজ্ঞা-উপায় বা শূন্যতা-করুণা (স্ত্রীতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব)-র মিলনকে বোঝায়। শূন্যতাকে বলা হয় 'প্রজ্ঞা' কারণ শূন্যতা জ্ঞানই তো হল প্রজ্ঞা। করুণাকে বলা হয় উপায় কারণ করুণাই বিশ্বজীবের মঙ্গালের উপায়। এই প্রজ্ঞোপায়ের মিলন হলে লাভ হয় বোধিচিত্ত। দর্শনের দিক থেকে শূন্যতাই হল গ্রাহক— principle of subjectivity; আর করুণা হল গ্রাহ্য— principle of objectivity; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুটি প্রবহমানধারা নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় যে অদ্বয়তত্ত্বে সেই অদ্বয়তত্ত্বই হল বোধিচিত্ত—সহজস্বরূপ। যোগসাধনার দিক থেকে দেখা যাবে আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ি আছে—একটি বামগা (শ্বাসবাহী নাড়ি) অপরটি হল দক্ষিণগা (প্রশ্বাসবাহী নাড়ি) এবং আরেকটি নাড়ি হল মধ্যগা। উভয় নাড়ির ক্রিয়া এবং ধারাকে অবলম্বন করে চলে সংসারগতি। এর একটি ভব (অস্তিত্ব) অপরটি নির্বাণ (অনস্তিত্ব), একটি সৃষ্টি অপরটি সংহার। একটি ইতি অপরটি নেতি। এই উভয় ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের স্বাভাবিক নিম্নগাধারাকে মদ্যগা পথে ঊর্ধ্বগা করতে পারলে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ মহাসুখ লাভ হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে এই নাড়িত্রয়ের নাম যথাক্রমে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা। একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে :

শূন্যতা ও করুণার মিলনে সাধক যে সহজানন্দ লাভ করেন তা হল চূড়ান্ত আনন্দ। সাধক বিভিন্ন আনন্দের স্তর অতিক্রম করে তবে সহজানন্দে উপনীত হন। এই সহজানন্দে উপনীত হওয়ার জন্য দক্ষিণা রসনা (পুরুষ স্বভাব) ও বামা ললনা (স্ত্রী স্বভাব) উভয়ের স্বাভাবিক নিম্নধারাকে নিয়ন্ত্রিত মধ্যগা অবধূতিকার মধ্যে ঊর্ধ্বগামী করলে সহজানন্দ লাভ করা যাবে।

ওপরের এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল সহজ মহাসুখ সহজযানীদের সাধ্যবস্তু এবং তাদের সাধনপদ্ধতি তন্ত্রাশ্রিত। তাদের সাধ্যবস্তু সম্পর্কিত ধারণায় যেমন বিভিন্ন যানের ধারণা মিশে আছে তেমনই তাদের সাধন-পদ্ধতিতেও তন্ত্রাচার (শিব-শক্তি তত্ত্ব) বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। তবু চর্যাকাররা ইঙ্গিতপ্রধান যে গীতিতে তাঁদের সাধন পদ্ধতি ও অনুভব তুলে ধরেছেন তার বিশিষ্টতা অস্বীকার করা যায় না।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' গ্রন্থে চর্যাকারদের এই সাধনপন্থাকে উলটাসাধন বলেছেন। প্রাসঙ্গিক পদ উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় সাধকদের মধ্যে এই উলটাসাধন—নিম্নগামী গতিকে ঊর্ধ্বগামী করা, বিরুদ্ধস্রোতে গমন—সুপ্রচলিত ছিল। চর্যাকারদের সাধনও এই ধারার অনুগামী। আবার বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ও বাউলরাও এই উলটাসাধন করেন।

অধ্যায় সংক্ষেপ : চর্যাকারদের সাধ্যবস্তু ও সাধনতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণায় বিভিন্ন বৌদ্ধ যানের মতাদর্শ মিশে আছে। এই সাধনতত্ত্ব বিশেষ দেহজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। বামগা ও দক্ষিণগার নিম্নগতিকে মধ্যগায় বিভিন্ন চক্র ও পদ্মভেদে ঊর্ধ্বগা করে সহস্রারে স্থিতি দিতে পারলে সাধ্যবস্তু সহজ মহাসুখ লাভ করা যায়। তখন আস্বাদন ও আস্বাদকের ভেদ লুপ্ত হয়।

১.৮ চর্যার ভাষা

চর্যার ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনাকে আমরা দুটি ভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করব। প্রথমত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থ অনুসারে বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সংক্ষেপে করব। পরে চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির বাচ্যার্থ ও আভিপ্রায়িক অর্থ সংক্রান্ত আলোচনাও আমাদের বিবেচ্য হবে।

চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা তার সপক্ষে আমরা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক যুক্তিগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরব। প্রথমে ধ্বনিতাত্ত্বিক যুক্তিসমূহ পেশ করা হল। এখানে মনে রাখতে হবে চর্যার ভাষা প্র--বাংলার উদাহরণ ; ফলে আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও থাকবে। ধ্বনিতাত্ত্বিক যুক্তি :

১) চর্যার অনেকস্থরে ই-কার আ-কারে পরিবর্তিত হয়েছে। দুই স্বরবর্ণের মধ্যে পরবর্তী স্বরটির য়-শ্রুতি অথবা ব-শ্রুতির আকার নেয়। অ কখনও ইঅ-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন—

দুলি দুলিহ পিটা ধরণ ন জাই।

রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥ (২ নং চর্যা)

এখানে আকারের ই-শ্রুতি স্বাভাবিক।

২) চর্যায় হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। চ্ছাড়ী (১৫ নং) চুম্বী (৪ নং)-র ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বর অনাবশ্যক। আবার ঋজু>উজু (১৫ নং) এবং উজু (৩২ নং) অর্থাৎ হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দুটি রূপ দেখা যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাতেও হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের বিভিন্নতা রক্ষিত হয় না।

৩) বাঙলায় বিভিন্ন জ, ন, ব ও স-এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। চর্যার আদর্শ পুথি লিখিত হওয়ার সময় এই উচ্চারণ-বিভিন্নতা লুপ্ত হয়ে গেছিল। যথা মণ (২০ নং) মন (৩০ নং)। ৫০ সংখ্যক চর্যাতে শবর ও সবরালী একসঙ্গে রয়েছে।

রূপতাত্ত্বিক যুক্তি :

১) বচন

ক) আধুনিক বাংলা ভাষায় কোনো কোনো কারকে একবচনে কোনো বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। চর্যা থেকে এরূপ উদাহরণ দাখিল করা যায়। কর্তৃকারকে—কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল (১)

খ. বহুবচন বোঝানোর জন্য আধুনিক বাংলার মতো বহুত্ববোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সঅল সমাহিঅ (১)

গ. সংখ্যাবাচক শব্দদ্বারা বহুবচন—পঞ্চবি ডাল (১)

ঘ. বিশেষণ পদ দু বার ব্যবহার করে বহুবচন—উঁচা উঁচা পাবত (২৮)

২) লিঙ্গ—আধুনিক বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিঙ্গ ব্যবহারের কঠোরতা না থাকলেও অপভ্রংশের প্রভাবে 'চর্যাগীতি' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ এই নিয়ম রক্ষিত হয়েছে। পরে লোপ পেয়েছে। চর্যায় নিসি অন্ধারী, (বিশেষণে স্ত্রী লিঙ্গাত্মক প্রত্যয়), হরিণা, শবরা (জাতিবাচক হলে পুরুষ জাতীয় অর্থে আ প্রত্যয়) ইত্যাদি রূপ দেখা যায়।

৩) সমাজ—প্রায় সবরকম সমাসের দৃষ্টান্তই চর্যায় পাওয়া যায়।

দ্বন্দ্ব : চান্দসুজ, বামদাহিন

রূপক : ভবজলধি, ভবণই

কর্মধারয় : ভাগতরঙ্গ, মহাসুহ

তৎপুরুষ : কমলরস, আসবমাতা

বহুব্রীহি : খমণভতারি, সপরবিভাগা

চর্যায় ভাষা যে বাংলা এ বিষয়ে চারটি বড়ো প্রমাণ হল :

১. ল, —ইল যোগ করে অতীতকাল গঠন। যেমন, 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গো।'

২. ব, —ইব যোগে ভবিষ্যৎ কাল গঠন। যেমন, 'জই তুম্হে লোঅ হে হইব পারগামী।'

৩. 'র' যোগে ষষ্ঠী। যেমনস, 'রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ'।

৪. প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার। যেমন, 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।'

খ. বিশ শতকে চর্যাগীতিগুলি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ চর্চার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মুনিদত্ত এর টীকা রচনা করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। চর্যার শ্রোতা পাঠকেরা যাতে এই গীতিগুলির অর্থভেদ করতে পারেন তার জন্য মুনিদত্ত টীকা রচনা করছেন। চর্যাগীতি-ব্যবহৃত শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হয়নি আভিপ্রায়িক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই আভিপ্রায়িক অর্থ বুঝতে গেলে মুনিদত্তের টীকাটি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিষয়টি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

যেমন ৬ নং চর্যাটি সরলার্থে পাঠ করলে মনে হবে হরিণ শিকারের বৃত্তান্তই এখানে মুখ্য। বিবরণটিও মনোগ্রাহী। চর্যাকার কিন্তু এই সরলার্থটুকুই তুলে ধরতে চাইছেন না—হরিণ শব্দটিকে তিনি তাত্ত্বিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এই ভিন্ন তাত্ত্বিক অর্থটিই আভিপ্রায়িক অর্থ। অবশ্য বিশেষ অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই সম-মর্যাদা সম্পন্ন নয়। মুনিদত্ত আভিপ্রায়িক অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলির কোনো কোনোটিকে সন্ধ্যাশব্দ বলেছেন। মুনিদত্তের টীকায় 'সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহু' বা 'সন্ধ্যাভাষয়া প্রতিপাদয়তি' জাতীয় উল্লেখ পাওয়া যাবে।

'সন্ধ্যা' শব্দটির বানান, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে বিতর্ক আছে। মহাযান শাস্ত্র ও ভাষ্যে সর্বত্র 'সন্ধ্যা' বানান লেখা হলেও বিধুশেখর শাস্ত্রী এটি ভুল বলে মনে করেন। তিনি সমু ধ্যৈ ধাতুর পরিবর্তে 'সম-ধা' থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন বলে মনে করেন। তাঁর মতে শব্দটি 'সন্ধ্যা' নয় 'সন্ধা'। প্রবোধচন্দ্র বাগচীও 'সন্ধা' মতাবলম্বী। কিন্তু শব্দটির সঙ্গে 'ধ্যৈ' বা ধ্যানের যোগ আছে বলে অনেকেই মনে করেন।

'শব্দকল্পদ্রুম'-এ 'সন্ধ্যা' ও 'সন্ধা' ভিন্ন ব্যুৎপত্তিসঞ্জাত একথা স্বীকৃত হলেও একটি আরেকটির প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত। 'সন্ধি' শব্দের সঙ্গে দুয়ের যোগ আছে। 'সন্ধি'র অর্থ হল শ্লেষ বা মিলন। 'সন্ধ্যা' ভাষার ভিতরেও যুগনদ্ধ তত্ত্বের মতো দুটি অর্থের শ্লেষ বর্তমান। একটি আভিধানিক, অন্যটি আভিপ্রায়িক। 'সন্ধ্যা' শব্দের বাচ্যার্থ সকলের কাছে স্পষ্ট, লক্ষণার্থ 'বিরলে বুঝই'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে 'আলো আঁধারি' ভাষা বলেছেন। বুর্নফ-এর মতে এ হল 'ভাষা প্রহেলী'।

মুনিদত্তের টীকা অনুসরণ করলে অবশ্য 'সন্ধ্যা' শব্দের অর্থ বোঝা সম্ভব। নীচে কয়েকটি 'সন্ধ্যা' শব্দের দুটি করে অর্থ প্রদান করা হল।

কমল কুলিশ—তন্ত্রার্থ পদ্ম-বজ্র, চর্যার্থ প্রজ্ঞা-উপায়

ধমণ চমণ—শ্বাস-প্রশ্বাস, চর্যার্থ আলি-কালি

জোইনি—যোগিনী, চর্যার্থ নৈরাত্মা বা জ্ঞানমুদ্রা

চর্যাগীতিতে আরেক রকম দ্ব্যর্থক শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি পরিচিত লোকজীবনের থেকে সংগৃহীত হলেও চর্যায় এগুলি ভিন্নার্থে ব্যবহৃত। আভিপ্রায়িক অর্থসমন্বিত হলেও টীকাকার এগুলিকে 'সন্ধ্যা' শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেননি। নীচে এরকম কয়েকটি আভিপ্রায়িক শব্দ ও তাদের দুই অর্থ প্রদান করা হল।

শুণ্ডিনি—মদ্য ব্যবসায়িনী, অবধূতিকা

কাচ্ছি—রজ্জু, অবিদ্যাসূত্র

খুণ্টি—খুঁটি, আভাষদোষ

অধ্যায় সংক্ষেপ : বিশ শতকে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রে চর্যাগীতির শব্দাবলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এগুলিকে প্র- বাংলার নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। চর্যার অব্যবহতি পরবর্তী সমকালে অবশ্য সাধনতত্ত্বের সূত্রেই শব্দার্থের টীকা-ব্যাখ্যা প্রদান করা হত। সাধারণ শব্দের পাশাপাশি চর্যায় বহু দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই অভিপ্রায়িক শব্দসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটিকে টীকাকার মুনিদত্ত 'সন্ধ্যা' শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১.৯ চর্যার সাহিত্যমূল্য

চর্যার সাহিত্যমূল্য বিচার করতে গেলে প্রথমেই আমাদের কতগুলি তাত্ত্বিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম প্রশ্ন হল যদি মেনে নেওয়া হয় গূঢ়ার্থব্যঞ্জক ভাষায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের আচরণীয় ও অনাচরণীয় কৃত্যের নির্দেশ প্রদানই এই গীতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল এবং সীমিত সমমনস্ক সাধকগোষ্ঠীর মধ্যেই এগুলি প্রচলিত ছিল তাহলে ব্যাপক অর্থে এর সাহিত্য মূল্য বিচার করা সংগত কি না ? এর উত্তরে বলা চলে চর্যাগুলি সমকালে কেমন করে আস্বাদন করা হত তার কোনা পাথুরে প্রমাণ নেই। তবে চর্যাগীতির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্মের কূটতাত্ত্বিকতার বাইরে সাহিত্য হিসেবেই যে এগুলি আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন তার চমৎকার পরোক্ষ প্রমাণ 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস থেকে দেওয়া সম্ভব।

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে শাস্ত্রীমশাই রাজপৃষ্ঠপোষণায় অনুষ্ঠিত এক কবি-সভার বিবরণ দাখিল করেছেন।

সেই কবি-সভায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার পর চাটিলপাদ, বীণাপাদ ও সরহপাদ কবিতা পড়েছেন। উপন্যাসের কথক জানিয়েছেন, 'সেকালে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ছয়টা ভাষায় কবিতা লিখিতে না পারিলে, সে মহাকবি হইতেই পারে না। তাই যাহারা শুধু বাংলাতেই কবিতা লিখিত, তাহাদের কবি না বলিয়া পদকর্তা বলা হইত।' কথক এই তথ্য উল্লেখ করেছেন মাত্র। তারপরে তাঁর বাচনে যে কবি-সভার বিবরণ রয়েছে তাতে বাংলা ভাষায় কবিতা পাঠের ফলে 'জয় জয় শব্দে সভাস্থল ভরিয়া গেল।' কথকের উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্ট। বাংলা ভাষা সাহিত্যের আত্মপ্রকাশক হিসেবে চর্যাগীতিগুলিকে তিনি তুলে ধরতে চান। গূঢ় আধ্যাত্মিক মূল্য যাই হোক না কেন এগুলির সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশাই নির্দ্বিধ। এখানে উপন্যাসে শাস্ত্রীমশাই তাঁর কল্পনায় চর্যাকারদের রঞ্জিত করছেন। ধর্মসাধনার গূঢ়তত্ত্বের পরিবর্তে কাব্যরসাস্বাদনের আনন্দই যেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছে মুখ্য।

শাস্ত্রীমশাইয়ের এই অভিপ্রায়কে আমরা তত্ত্বের অন্য কাঠামো দিয়েও সমর্থন করতে পারি। রোলান্ড বার্থ (Roland Barthes) তাঁর 'The Death of the Author' প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন প্রতি মুহূর্তে রচনাটি (text) কেমন করে রচয়িতার (author) কর্তৃত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও বলা চলে চর্যাকাররা যে উদ্দেশ্যেই গীতিগুলি রচনা ও আস্বাদন করুন না কেন ক্রমশই পদগুলি তাঁদের সেই আভিপ্রায়িকতা অতিক্রম করে স্বাধীন আস্বাদনের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই পদগুলির মধ্যে এমন উপাদান ছিল যার সাপেক্ষে আস্বাদনের ভিন্নতর এক জগৎ নির্মাণ সম্ভব। এই গীতিগুলির সাহিত্যমূল্য বিচারের সময় এই কথাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সাহিত্যমূল্য বিচারের জন্য আমরা কতগুলি সূত্রের উল্লেখ করব মাত্র।

ক. চর্যাগীতিগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে চর্যারচয়িতারা তাঁদের পদগুলিতে সাধারণ জীবনের নানা তথ্য প্রয়োগ করেছেন। এই তথ্য বিবৃতিমাত্র নয়, জীবন সম্বন্ধে গভীর সমবেদনাই এর মধ্যে ধরা পড়েছে। ফলে সাধারণ পাঠক আভিপ্রায়িক অর্থ বাদ দিয়ে গীতিগুলি পাঠ করলে অন্য সাহিত্যধারার মতোই জীবনযাত্রার নানা মনোগ্রাহী চিত্র লাভ করেন। উদাহরণ দাখিল করা যেতে পারে।

২নং চর্যায় যে বউটির কথা আছে সে দিনের বেলায় ভীত অথচ রাত্রি বেলায় কামমত্ত হয়। এই অংশটির আভিপ্রায়িক অর্থ যাই হোক না কেন বধূর কপটতার বিবরণ কৌতুকবাহী।

খ. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা' পুস্তকে চর্যাপদের মধ্যে লিরিকের (lyric) বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। চর্যাগীতিগুলিকে আধুনিক অর্থে পুরোপুরি লিরিক হয়তো বলা যাবে না। অবশ্য যদি মনের আবেগের (emotion) স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ গীতিকবিতার (lyric) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে কোনো কোনো চর্যাকে গীতিকবিতা বলা যেতেই পারে। কাহ্নপাদের লেখা ১০ নং চর্যায় আছে 'আলো ডোম্বি তোএ সম করবি ম সাঙ্গ / নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাগ' মনীন্দ্রমোহন বসু এর ভাবানুবাদ করেছেন : 'ডোম্বি, তোর সহ আমি করিবই সঙ্গ। / কানু যে কাপালী যোগী নির্ঘৃণ উলঙ্গ।' পঙ্‌ক্তিদুটি সরলার্থেই তীব্র আবেগপূর্ণ প্রেমের বাচন হিসেবে গৃহীত হতে পারে—আধুনিক অর্থে একে লিরিক বলতেও আপত্তি নেই।

গ. হরিণ বিষয়ক চর্যায় হরিণের ওপরে সরলার্থে মানবত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' এই পঙ্‌ক্তিটি গূঢ়ার্থে নয় সরলার্থেই প্রবচন হয়ে উঠেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পাওয়া যাবে 'আপনার মাসে হরিণী জগতের বৈরী' পঙ্‌ক্তিটি। রাধা কৃষ্ণের আচরণে বিব্রত, বিচলিত। অসহায়া নারী হিসেবে পুরুষের এই আচরণ তাকে সহ্য করতে হচ্ছে এই প্রেক্ষিতে সম্প্রসারিত অর্থে চর্যার পঙ্‌ক্তিটি ব্যবহৃত। চর্যার কাব্যমূল্য যথেষ্ট বলেই এ জাতীয় সম্প্রসারণ সম্ভব।

ঘ. কোনো কোনো চর্যা প্রায় ছোটো গল্পের আদলে রচিত। নাটকীয়তার চমৎকার নির্দশন সেখানে পাওয়া যাবে। হরিণ বিষয়ক চর্যাটি নাটকীয়। ভুসুকু পাদের রচিত ২১ নং চর্যায় আছে এক ছটফটে ইঁদুরের কথা। সরলার্থে পড়লে মনে হবে ইঁদুরটি ধরা না দিয়ে কেমন করে ভুসুকুকে নাকাল করছে তারই রংদার গল্প যেন পরিবেশিত হল।

ঙ. চর্যায় সমাজজীবনের নানা ছবি আছে। কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক সমাজের এই ছবি জীবনবোধ জারিত। প্রকাশের ভাষাটিও প্রত্যক্ষ অথচ তার মধ্যে নিছক বিবৃতিমাত্র নেই। ঢেন্ঢণপাদের চর্যায় আছে প্রতিবেশীবিহীন টিলাবাসীর কথা। একাকীত্বের বেদনা পাঠকচিত্তকেও জারিত করে। ভাষা এখানে চিত্ররূপময়।

অধ্যায় সংক্ষেপ : চর্যা দেহতত্ত্বের গান হিসেবে রচিত ও প্রচারিত হলেও আমরা পাঠকেরা সেই মর্মে এই পদগুলিকে নাও পড়তে পারি। গীতিগুলির মধ্যে এমন উপাদান আছে যা আধ্যাত্মিক গূঢ়ার্থকে অতিক্রম করে নিছক কাব্য হিসেবে পাঠ করার জন্য পাঠককে আকর্ষণ করে। এ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

চর্যাপদের সমাজ :

উনিশ শতকে ইতিহাস বিদ্যাচর্চার জন্ম হল। এই বিদ্যাচর্চার অনুষঙ্গে জাতীয়াতাবাদী আবেগের বশবর্তী হয়ে বাঙালি তার অতীত সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধানে ব্রতী হল। এই সামাজিক ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান সাহিত্য। তবে মনে রাখতে হবে সাহিত্য তো আর পাথুরে প্রমাণ নয় তাই সাহিত্য-উপাদান থেকে সমাজ-ইতিহাসের নানা আনুমানিক প্রবণতাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি মাত্র।

চর্যার পদগুলিতে যে সমাজের চেহারা আমরা পাই তা বঙ্গভাষী সমাজ—বাঙালি সমাজ বলা অনুচিত। কারণ বাঙালি ও বাঙালিয়ানা এই ভাষা-জাতি সত্তার জন্ম তখনো হয়নি। আর একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে আমরা বঙ্গভূমি বলতে যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে বুঝি চর্যাপদের সময় বঙ্গভূমি বলতে সেই ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে বোঝাত না—আরও বিস্তৃত ভূভাগকে বোঝাত। সুতরাং চর্যাপদের বর্ণনাভূত অঞ্চলটি ঠিক এখানকার বঙ্গভূমি নয়।

সামাজিক নানা বৃত্তান্তই চর্যায় পাওয়া যায়। আমরা তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা প্রদান করছি মাত্র—

ক. বেশভূষা : উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসবই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥ (২৮)

[শবরবালা পরেছে ময়ূরের পাখ, গলায় তার গুঞ্জ মালা]

খ. বিনোদন : নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই।

[নৃত্যগীত নাটক এসব ছিল অন্যতম বিনোদন]

গ. ব্যবহৃত দ্রব্য : পিটা (দুগ্ধ দোহনপাত্র), ঘড়ি (ঘড়া) ; ঘড়ুলি (গাড়ু)।

ঘ. ভূষণ : কাণেট (কর্ণভূষণ), ঘন্টানেউর (নূপুর)।

ঙ. দারিদ্র : হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী (৩৩)।

চ. অস্পশ্যতা : নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ (১০)।

জ. নৈতিকতা : চর্যায় আছে পরকীয় প্রেমমত্ত বধূর কথা। যথা
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ॥ (২)

এই তালিকাটি দীর্ঘতর করা সম্ভব। কিন্তু তালিকা দীর্ঘ না করে একটি তাত্ত্বিক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া দরকার। পাঠ্যগুলির প্রেক্ষিত (context) বিচার না করে শুধু সমাজচিত্র হিসেবে সাধারণীকরণ করলে বিপদ হবে। যেমন ২ নং চর্যায় আছে দ্বিচারী বধূর কথা। এবার যদি মনে করা হয় যে সেই সমাজে দাম্পত্যজীবন

ছিল শিথিল, যেমন ছিল আভির উপজাতির সমাজে, তাহলে তা সাধারণীকরণ হবে। কারণ চর্যাকারেরা বিশেষ তাত্ত্বিক ভাবনা প্রকাশের জন্য রূপক নির্মাণার্থে এই উদাহরণটি চয়ন করেছিলেন। এর থেকে সেই সমাজে যৌন শিথিলতা ছিল সাধারণ ঘটনা একথা বলা যাবে না। অর্থাৎ ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করতে গেলেও পাঠ্যের পরেক্ষিতটি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গান ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কাণেট চৌরি নিল অধরাতী॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইরে কামরু জাঅ॥
অইসনি চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইউ।
কৌড়ি মঝেঁ একু হিঅহি সমহিউ॥ (২)

সরলার্থ : মাদি কচ্ছপকে দোহন করে দুগ্ধপাত্রে দুধ ধরে না। গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়। হে প্রসূতি, শোন, আঙিনাকে ঘরে প্রবেশ করাও। মধ্যরাত্রে চোর কর্ণভূষণ চুরি করল। শ্বশুরকে ঘুম পাড়িয়ে বধূটি জাগে। চোর কানেট নিল, কোথায় গিয়ে চাওয়া যায় ? দিনের বেলা বউটি ছায়া পুরুষে ভয় পায়। রাতে কামনগরে যায়। কুক্কুরীপাদ এই চর্যা গান করেন, কোটির মধ্যে গুটিকে তা বোঝে।

অন্যান্য মন্তব্য : শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'-এ কুক্কুরীপাদের রচিত দুটি চর্যা আছে (২, ২০)। আর একটি চর্যা (৪৮) ছিন্ন। দুটি চর্যাই গূঢ়ার্থ বোধক। আপাত অসম্ভব কিছু ভাষণ রয়েছে, নিহিতার্থে তার অন্যতর গুরুত্ব আছে। দুশ্চরিত্রা নারীর চিত্রটি মনোগ্রাহী।

গূঢ়ার্থ : দুলি 'সন্ধ্যা' শব্দ। সাধারণ অর্থ স্ত্রী কচ্ছপ, গূঢ়ার্থ নৈরাত্মাদেবী। নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে বজ্রচিত্তের মিলনে বোধিচিত্তের জন্ম হচ্ছে ও বোধিচিত্ত নির্মাণকায়ে নেমে বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। এটি দুলির দুগ্ধ দোহন। এরপরে আছে গাছের তেঁতুল কুমীর খায়। কুমীর অর্থাৎ কুম্ভক সমাধি। ইন্দ্রিয় নিরোধক এই সমাধির যোগে বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করা হচ্ছে। ঘরের অর্থাৎ দেহের মধ্যেই রয়েছে সহজানন্দের উন্মুক্ত আঙিনা। বধূ অর্থাৎ পরিশুদ্ধা অবধূতিকা। তার কানের অলংকার চোরে নিল অর্থাৎ প্রকৃতি দোষ হরণ করল সহজানন্দ। অপরিশুদ্ধা অবধূতিকা কালের ছায়া দেখে ভয় পায় এবং অপরিশুদ্ধা পরিশুদ্ধা হয়ে সময়কে অতিক্রম করে সহজানন্দে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। শ্বশুর অর্থাৎ শ্বাসবায়ু স্তব্ধ হলে অবধূতিকা জাগে।

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।... ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসঅ। (৬)

সরলার্থ : কাকে ছেড়ে কাকে নিয়ে কেমন আছ ? চারদিকে বেড়া ডাক পড়ছে। নিজের মাংসের জন্য হরিণা নিজের বৈরী। ভুসুকু ব্যাধ তাকে মুহূর্তের জন্য ছাড়ে না। হরিণ ঘাস ছোঁয় না, জল খায় না। হরিণীর নিবাসস্থল সে জানে না। হরিণী বলল, হরিণা এ বন ত্যাগ কর। তরঙ্গাগতি হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

অন্যান্য মন্তব্য : চিত্তাকর্ষক পশুকথার রূপকে ভুসুকু গূঢ়ার্থ পেশ করেছেন। এখানে যেন হরিণ ও হরিণাকে মানবায়িত করা হয়েছে।

নিহিতার্থ : চঞ্চল হরিণ হল সাংবৃতিক চিত্ত। হরিণী হল ভাবগ্রহ হরণকারী ধর্মমুদ্রা। হরিণরূপ সাংবৃতিক চিত্তের চতুর্দিকে কালরূপ শিকারীর মারণ-হুংকার যখন পরিব্যাপ্ত তখন সেই অবস্থায় নৈরাত্মাকে গ্রহণ করে কীভাবে সে মুক্তি পেল এই চর্যায় সেই বিবরণ বর্তমান।

অবিদ্যা প্রভাবিত চিত্তকে ভুসুকু গুরু বচনরূপ বাণদ্বারা প্রহার করেন। প্রহারে প্রবুদ্ধচিত্ত পারমার্থিক সহজরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পানাহার রূপ জাগতিক ভোগ ত্যাগ করে হরিণীরূপ নৈরাত্মার কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়। নৈরাত্মার আহ্বানে তীব্র গতিতে অবধূতী মার্গে চিত্তের ঊর্ধ্বায়ন হয়, তখন আর সাংবৃতিক রূপ দেখা যায় না।

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।... বাটত মিলিল মহাসুহসঙ্গা। (৮)

সরলার্থ : সোনায় পরিপূর্ণ করুণা নৌকা। রুপো রাখার ঠাঁই নেই। শূন্য আনন্দ সমুদ্রের দিকে বয়ে চলল, যাতে ফিরে আসতে না হয়। খুঁটি উপড়ে কাছি খোলা হল। পাকা ওস্তাদের পরামর্শ নিয়ে বয়ে চল। পথ চলার সময় চারিদিক দেখে নাও। কোড়ুয়াল ছাড়া কি নৌকা বাওয়া যায় ? বাম দক্ষিণ চেপে মার্গপথে চলতে চলতেই মহাসুখের সঙ্গা মিলল।

অন্যান্য মন্তব্য : নৌ-যাত্রার চিত্রটি প্রমাণ করে যে ভূমিভাগে চর্যাকার বসবাস করতেন সেই ভূমি-ভাগটি নদীবহুল। বাংলা কবিতায় নৌ-যাত্রার চিত্র রূপকার্থে বহু ব্যবহৃত। এই চর্যাটি সেই ধারারই যেন অন্যতম আদি নিদর্শন।

নিহিতার্থ : শূন্যতার দ্বারা করুণার নৌকা পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন হয়েছে। ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান না থাকায় মিথ্যা রূপজ্ঞানও বিলুপ্ত হল। এই অবস্থায় সর্বশূন্যরূপ গগনের দিকে যাত্রা করলে পুনর্জন্ম রহিত নির্বাণ লাভ হয়। এই নৌচালনা অর্থাৎ শূন্যতাভিমুখী যাত্রার উপায় আভাস দোষ (খুঁটি) ও শাস্ত্রজ্ঞান (কাছি) ত্যাগি। এরপর সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুযায়ী (কোড়ুয়াল) সতর্ক হয়ে চিত্ত-নৌকা চালনা করতে হবে। গুরুবচন গ্রহণ করে বামগা ও দক্ষিণগা নাড়িদ্বয়কে একত্র করে মদ্যগা নাড়িতে মিলিত করলে বিরমানন্দের পথে মহাসুখের সঙ্গা লাভ করা যায়।

নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ...মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ। (১০)

সরলার্থ : নগরের বাইরে ডোমনি তোর কুড়ে। তুই বড়ু ব্রাহ্মণের ছোঁয়া এড়িয়ে যাস। ও ডোম্বি, নির্ঘৃণ লেংটা কাপালি যোগী আমি কাহ্ন তোর সঙ্গো মিলিত হব। চৌষট্টি পাঁপড়ি বিশিষ্ট পদ্মে বাউলি ডোম্বি নাচে। ও ডোমনি, তোকে ভালো কথায় শুধোই কার নৌকায় তোর আসা-যাওয়া। যোমনি তুই চাঙ্গারি বেচিস। তোর জন্য আমিও নটসজ্জা ত্যাগ করেছি। তুই ডোম্বি আমি কাপালি। তোর জন্য আমি হাড়ের মালা পরেছি। সরোবর সেঁচে ডোম্বি মৃণাল খায়, আমি ডোম্বিকে মারব তার প্রাণ নেব।

অন্যান্য মন্তব্য : পুরুষ প্রেমিকের সুতীব্র বাচন হিসেবে চর্যাটি পড়া যেতে পারে। পদ্মের ওপরে নৃত্যের অনুরূপ চিত্র আছে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গালের বণিকখণ্ডে, কমলেকামিনী বৃত্তান্তে। গলায় হাড়-মালা অনুরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে সহজিয়া বৈষ্ণব পুঁতি 'আনন্দভৈরব'-এ।

নিহিতার্থ : পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মার সঙ্গো কাপালিক কাহ্নের লীলাই এই গানের মুখ্য বিষয়। দেহনগরীর

বাইরে নৈরাত্মার অধিষ্ঠান। শাস্ত্রাভিমানী যোগীদের চপলচিত্ত নৈরাত্মার আভাস পায় মাত্র কিন্তু তাকে অধিকার করতে পারে না। নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য বলেই কাহ্ন ঘৃণালজ্জাদোষরহিত হয়ে নৈরাত্মার সঙ্গে মিলনে উৎসুক। কাহ্ন পরিশুদ্ধাবধূতি মার্গে আরূঢ় হওয়ায় তাঁর নির্মাণচক্রে কল্পিত নাভিকমলে বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটেছে। নৈরাত্মার অতীন্দ্রিয় স্বরূপ উপলব্ধি করে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে সে সংবৃতিবোধিচিত্তরূপ নৌকায় যাতায়াত করে কিনা। সংসার-রূপ নটসজ্জা ত্যাগ করে কাহ্ন চিত্ত শুদ্ধ করেছেন। মৃত ব্যক্তির মতো নির্বিকার চিত্তে হাড়ের মালা পরেছেন। অপরিশুদ্ধাবধূতী কায়রূপ সরোবর ভেঙে মৃণালরূপ বোধিচিত্তকে ভক্ষণ করে। এ অবস্থায় অবিদ্যা নাশ হয় না। তাই তিনি নৈরাত্মাকে মারতে অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকৃত করতে চান।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।... বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই। (১৭)

সরলার্থ : সূর্য লাউ আর তন্ত্রী হল শশী। দুইকে অবধূতীর সঙ্গে এবার করে অনাহত দাঁড়ায় লাগানো হল। হে সখি, হেরুক বীণা বাজে। করুণা শূন্যতা নাদে বিলাস করে। সারি গণনা করে বীণায় লগ্ন কড়ে আঙুলকে হাতের আংটায় চাপা হলে বত্রিশ তারের অনুরণন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। বজ্রধর নৃত্য করেন, গান করেন দেবী। বুদ্ধ নাটক শান্তিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অন্যান্য মন্তব্য : চর্যাটি প্রমাণ করে নাঠ্যধারার প্রাচীনতা, সমাজে নৃত্য-গীতের পরম্পরাও ছিল। অন্যান্য ধর্মেও নাদ ও সুর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

নিহিতার্থ : হেরুকযোগে সাধনা করলে সহজানন্দ পাওয়া যায়। কমল-কুলিশ যোগে (চন্দ্র সূর্য) প্রভাস্বর চিত্ত সহজসুখ। শূন্যতা শব্দতরঙ্গে সেই সুখের ব্যাপ্তি। এই সুখে মুদিত হয়ে বজ্রধর নৃত্য করেন গান করেন নৈরাত্মা। নির্বাণ প্রদায়ী শান্তি প্রাপ্তি হয়।

নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা।... ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ। (২১)

সরলার্থ : অন্ধকার রাত্রি। ঘরে ইঁদুরের চলাফেরা। মূষিক মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করে। হে যোগি চঞ্চল মূষিক পবনকে মার, যাতে তার আনাগোনা বন্ধ হয়। সে মাটি তোলে, গর্ত করে। চঞ্চল মূষিককে নাশের ব্যবস্থা কর। কালো বলে বর্ণ বোঝা যায় না, শূন্যে উধাও হয়। পাকা লোকের উপদেশে তাকে নিশ্চল কর। যখন ইঁদুরের নড়াচড়া বন্ধ হয়, ভুসুকু বলেন তখন ভববন্ধন ঘোচে।

অন্যান্য মন্তব্য : চমৎকাল কৌতুককর এই ইঁদুর ধরার বিবরণ। প্রায় যেন না-মানুষী ইঁদুরের গল্প।

নিহিতার্থ : অবিদ্যা তিমিরে আবৃত সংবৃতচিত্ত নিত্য বিচরণশীল চঞ্চল ইঁদুরের মতো রূপাদি বিষয়সমূহে বিচরণ করে বোধিচিত্তজ মহাসুখামৃত বিনষ্ট করে। যোগীরা পবনের মতো চঞ্চল চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করে। ইঁদুর যেমন মাটি তুলে গৃহ নষ্ট করে তেমনই চঞ্চলচিত্ত অবিদ্যার বশে বোধিচিত্তকে বিনষ্ট করে। সংবৃত চিত্তই সহজচিত্তে পরিণত হয়। ভুসুক বলেন চিত্তের অবিদ্যা চাঞ্চল্য দূর হলে ভববন্ধন লুপ্ত হয়।

উম্বা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।... গিরিবরসিহর/সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ॥ (২৮)

সরলার্থ : পর্বত শিখলে শবরীবালার বাস। তার অলংকার ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালা। শবরী শবরকে বলে, পাগল শবর দোহাই তোমার গোল কোরো না। আমি তোমারই গৃহিণী—সহজসুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হল, ডাল গগন স্পর্শ করল। ত্রিধাতুর খাট পাতা হল, শবর শয্যা-বিস্তার করল। নায়ক-নায়িকার কেলিরসে রাত্রি প্রভাত হল। নায়ক তাম্বুল-কর্পূর খায়, নৈরামণিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত্রি প্রভাত করে। গুরুবাক্যে বাণ যোজনা করে পরম নির্বাণরূপে লক্ষভেদ করে। উন্মত্ত শবর গুরুরোষে গিরিশিখর সন্ধিতে প্রবেশ করল তাকে আর কেমন করে খোঁজা যায়?

অন্যান্য মন্তব্য : ব্রাত্য শবর জীবনের লীলাবিলাসের ছবি বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। ধোয়ীর 'পবনদূত'-এ স্বৈর ক্রীড়ারসিক শবরীর কথা আছে।

নিহিতার্থ : মিলনের ফলে উদ্ভূত পরম সহজ সুখের কথা বলা হয়েছে। গুরু-উপদেশে শিষ্য সহজচক্রের দিকে যাত্রা করে—সহজে লীন হলে আর নির্গমন নেই, তখন চিত্ত পার্থিব ধরাছোঁয়ার অতীত।

ভাব না হোই অভাব ণ জাই।... জা লই অচ্ছম তাহের/উহ ণ দিস। (২৯)

সরলার্থ : ভাব হয় না অভাব হয় না এমন বস্তুতে কে প্রত্যয় করে ? বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য, ত্রিধাতুতে (কায়বাক্ চিত্তে) তার বিলাস তাও জানা যায় না। যার বর্ণ-চিহ্ন-রূপ নেই বেদাগম তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ যেমন সত্য নয়, মিথ্যাও নয় তেমনই শুদ্ধ বিজ্ঞান অনাখ্যাত কী নিয়ে ভাবনা করব ? যা আছে তারই উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

অন্যান্য মন্তব্য : চাঁদ ও জলে চঁদের প্রতিবিম্ব অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীদের প্রচলিত উপমা। শংকরাচার্যের ঘটাকাশের (ঘটের জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ) কথা মনে পড়বে।

নিহিতার্থ : ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব—এর কোনোটিই সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। পরম সত্য আসলে দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান। সমস্ত অস্তিত্ব-প্রবাহের মধ্যে অলক্ষিতভাবে তা বিলাস করছে। ভাষায় ব্যাখ্যা করে তা বোঝানো যায় না। লুই ভাব্য-ভাবক-ভাব তিনের ঊর্ধ্বে উঠেছেন বলে তাঁর কোনো ভাবনা নেই।

টালত ঘর মোর নাহি পড়বেষী...ঢেনঢন পা এর গীত বিরলে বুঝঅ। (৩৩)

সরলার্থ : টিলায় আমার ঘর। প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই। নিত্য প্রণয়ীর আনাগোনা। ক্ষুদ্র সংসার বৃদ্ধি পায়। দোহন করা দুগ্ধ কি বাঁটে প্রবেশ করে ? বলদ প্রসব করল গাভী বন্ধ্যা। পাত্র পূর্ণ করে তাকে তিন বেলা দোহন করা হয়। যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু, নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঢেনঢন পাদের গীত একান্তে বা অল্পজন বোঝে।

অন্যান্য মন্তব্য : শেষের প্রহেলিকাময় পঙ্‌ক্তিগুলি বাদ দিলে একাকিনী রমণীর বিবরণটি মনোগ্রাহী। হাঘরে দরিদ্র্যের কথা আছে।

নিহিতার্থ : সহজচক্রে (টালত) আছেন নৈরাত্মাদেবী তিনি নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সর্বশূন্য। তার সঙ্গ করেন বজ্রযোগী ফলে সংবৃত চিত্তের উৎপত্তি। এই সংবৃত চিত্তই সহজ চিত্তে পরিণত হয়। প্রহেলিকায় তারই আভাস দেওয়া হল। সংবৃতচিত্ত শৃগালের মতো নোংরা ঘণাটে আবার সহজচিত্তে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য সিংহের মতো সংগ্রাম করে।

জা মণ গোএর আলাকালা...কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা। (৪০)

সরলার্থ : যা মনোগোচর তা সংকল্পবিকল্পাত্মক। কায়বাকচিত্ত যেখানে প্রবেশ করে না তাকে কেমন করে বলা যাবে ? বাক্‌পথাতীতকে প্রকাশ করা যায় না——বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন। যত বলা হয় সে সবই মিথ্যা। গুরু বোবা শিষ্য বধির। কাহ্ন বলেন রতিবিলসিত অনুত্তর সুখ (জিনর-) কেমন ? যেমন কালো বোবা দ্বারা সংবোধিত হয়।

নিহিতার্থ : সহজতত্ত্ব কায়বাক্‌চিত্তের অতীত, ইন্দ্রিয় দ্বারা দুর্বোধ্য, সহজ স্বসংবেদ্য। গুরু সংকেতে তার আভাস দিতে পারেন মাত্র।

১.১০ অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত / সংক্ষিপ্ত :

১. চর্যাপদের আবিষ্কারক কে ?

২. মুনি দত্ত কে ?

৩. 'সন্ধ্যা' শব্দ কাকে বলে ? দুটি উদাহরণ দিন।

৪. চর্যায় ব্যবহৃত সমস্ত আভিপ্রায়িক শব্দই কি 'সন্ধ্যা' শব্দ ?

৫. চর্যার ভাষা বাংলা-এর সপক্ষে দুটি যুক্তি দিন।

নাতিদীর্ঘ প্রশ্ন :

১. চর্যাবর্ণিত সাধনতত্ত্বের পরিচয় দিন।

২. পাঠ্য চর্যাগুতিগীলির সাহিত্যমূল্য বিচার করুন।

৩. পাঠ্য চর্যাগুলিতে সামাজিক জীবনযাত্রার যে বিবরণ আছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—*চর্যাগীতির ভূমিকা*

২. মণীন্দ্রমোহন বসু—*চর্য্যাপদ*

৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত—*বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*

৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—*চর্যাগীতি*

৫. নীলরতন সেন—*চর্যাগীতিকোষ*

৬. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়—*বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা*

৭. Sashi Bhusan Dasgupta— *Obscure Religious Cults of Bengal*

৮. সুকুমার সেন—*চর্যাগীতি-পদাবলী*